Vol. 3 | No. 1 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শেখ ফজলল করিম ও তাঁর রচনা

Volume	3
Issue	1
Year	1959
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Anisuzzaman
Published online	June 15, 1959
DOI	10.62328/sp.v3i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v3i1.2
Pages	25-60
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

শেখ ফজলল করিম ও তাঁর রচনা

Check for updates

আনিসুজ্জামান

মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭—১৯১২) পদাঙ্ক অনুসরণ করে যেসব বাঙালী মুসলমান আধুনিক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গদ্যলেখক হিসেবে মোজাম্মেল হক (১৮৬০—১৯৩৩) ও লিরিক কবি হিসেবে কায়কোবাদ (আ° ১৮৫৮—১৯৫২) বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিছুকাল পর আমরা আর দু জন সুপরিচিত লেখকের সাক্ষাৎ পাই: ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০—১৯৩১) ও শেখ ফজলল করিম[১] (১৮৮২—১৯৩৬)। মোজাম্মেল হকের মতো এঁরাও গদ্য ও পদ্য দুইই রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর মতো এঁরাও প্রধানতঃ গদ্যলেখক। ইসমাইল হোসেন ও ফজলল করিম উভয়েই আবাল্য সাহিত্যচর্চা করেছেন: একজন প্রথম কবিতা রচনা করেন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে,[২] অন্যজন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় একটা গোটা কবিতার বইই প্রণয়ন করে ফেলেন[৩]। তবে — এজন্যে নয়, রচনাকুশলতার দিক দিয়ে— ফজলল করিমের দাবী বোধহয় ইসমাইল হোসেনের ওপরে।

১। তাঁর প্রথম যুগের বইগুলোতে নামের বানান ছিল: সেখ ফজলল করিম (তৃষ্ণা, মানসিংহ), পরে তা হয়: শেখ ফজলল করিম (ছাস্নাতত্ত্ব, পরিত্রাণ ইত্যাদি)। একটি বইয়ের আখ্যাপত্রে পাই: শেখ ফজলুল করিম, যদিও ভূমিকার নীচে স্বাক্ষর আছে: শেখ ফজলল করিম (আফগানিস্থানের ইতিহাস)। তাঁর কোন কোন বইয়ের সাম্প্রতিক সংস্করণে নাম আছে: শেখ ফজলল করীম (বিবি রহিমা, তৃ-স; পথ ও পাথেয়, দ্বি-স)। অধিকাংশ বইয়ের বানান অনুযায়ী এখানেও শেখ ফজলল করিম লিখিত হল।

২। এম. সিরাজুল হক: শিরাজী-চরিত (কলিকাতা: শিরাজী লাইব্রেরী, ১৯৩৫)।

৩। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬), পৃ ১৯৪।

শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ, কাব্যরত্নাকর (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ এসব উপাধি তিনি নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন) -এর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও আমাদের ধারণা শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ। আমরা কেবল জানি যে, রংপুর জেলার কাকিনা গ্রামে আমিরউল্লাহ্ সরদারের ঔরসে ও কোকিলা বিবির গর্ভে তাঁর জন্ম হয়[৪] —১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে[৫]। কাকিনায় পাঠদ্দশায় তাঁর কবিত্বের বিকাশ হয়।[৬] নানা পত্রপত্রিকায় তিনি রচনা প্রকাশ করতে থাকেন এবং গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩১৫ সালে কাকিনা থেকে 'বাসনা' নামে একটি মাসিকপত্র তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়[৭] এবং দু বছর সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হয়[৮]। 'জমজম' ও 'কল্লোলিনী নামে আরো দুটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়। আমি তাঁর আঠারোটি প্রকাশিত বইয়ের খোঁজ পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে তাঁর মোট গ্রন্থসংখ্যা বলা হয়েছে ছাব্বিশ, অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো।[৯] ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে,[১০] মতান্তরে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে,[১১] তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

শেখ ফজলল করিম যেকালে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, সেকালে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে দুটি চিন্তা রীতিমতো স্থানলাভ করেছে ঃ ধর্মসম্প্রদায়

৪। ঐ, পৃ ১৯৩।

৫। আশরাফ সিদ্দিকী ঃ "মুনশী মেহেরুল্লাহ্র মৃত্যুতে শেখ ফজলুল করিমের শোক গাঁথা", মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৬২। এই তারিখ তিনি পেয়েছেন ফজলল করিমের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিতে। এই আত্মজীবনীটি এখনো প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানিনা।

৬। হাই ও আহসান ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৪।

৭। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় ঃ সাহিত্য পঞ্জিকা (কলিকাতা, ১৩২২), পৃ ১৪৭।

৮। ঐ, পৃ ১০৬।

৯। হাই ও আহসান ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৪।

১০। আশরাফ সিদ্দিকী ঃ পূর্বোক্ত। কবির আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে এই তারিখ তিনি পেয়েছেন।

১১। 'বিবি রহিমা'র তৃতীয় সংস্করণের (১৯৩৯) বিজ্ঞাপনে প্রকাশকের নিবেদন।

হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্যবোধ আর বর্তমান দুরবস্থা সম্পর্কে সসঙ্কোচ সচেতনতা। সেইসঙ্গে ভবিষ্যতে উন্নতিলাভ সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট আশাবাদী চেতনাও গড়ে উঠছিল। ফজলল করিমের ব্যক্তিগত পরিবেশের দিকে তাকালে আমরা গভীর সুফী প্রভাব লক্ষ্য করি। বংশানুক্রমে তাঁরা ছিলেন চিশতিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পীরদের মুরীদ। সুফী ভাবধারাপুষ্ট পীরবাদ তাঁর আন্তরিক সমর্থনও লাভ করেছিল। 'পথ ও পাথেয়'র অবতরণিকায় তিনি তাই বলেছেন :

> ক্ষুধা যেমন অকাট্য সত্য হইয়া দুনিরীক্ষ, বিধাতাও তেমনি সত্য অন্তরঙ্গ হইয়াও দুদর্শ। তাঁহাকে অনুভব করিবার, হৃদয়ে ধরিবার জন্য জীবন ধারাটিকে কিরূপে সজ্জিত করিতে হইবে, মানুষ মাত্রেরই তাহা শিক্ষা করা উচিত।
>
> এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের আশ্রয় লইতে হয়।......এ পথের "গাইড"—গুরু ব্যতীত পথ চলা সাধারণতঃ অসম্ভব।

সুফীমতের একটি মূলকথা এখানে তিনি বলেছেন। এর মধ্যে আমরা যেন দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর (মৃত্যু ১১১১ খৃষ্টাব্দ) উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই :

> ...the disciple [*murid*] must of necessity have recourse to a director [*shaikh*, or in persian *pir*] to guide him aright. For the way of the faith is obscure, but the devil's ways are many and patent, and he who has no shaikh to guide him will be led by the devil into his ways. Wherefore the disciple must cling to his shaikh as a blind man on the edge of a river clings to his leader, confiding himself to him entirely, opposing him in no matter whatsoever, and binding himself to follow him absolutely. Let him know that the advantage he gains from the error of his shaikh if he should err, is greater than the advantage he gains from his own rightness, if he should be right.[১২]

বংশগতভাবে সংক্রামিত এই সুফী ভাবধারা তাঁর সাহিত্যসাধনাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

১২। quoted in H. A. R. Gibb: Mohammedanism (2nd ed., London: Oxford University Press, 1950), pp 150-51.

এর উপরে, মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র (১৮৬১-১৯০৭) প্রভাবও তাঁর জীবনে কার্যকরী ছিল। মেহেরুল্লাহ্‌ অবশ্য শরীয়তপন্থী ছিলেন এবং শরিয়তপন্থীদের সঙ্গে সুফীবাদীদের মত ও পথের ব্যবধান যত বড়ই হোক না কেন, মেহেরুল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ ইসলাম প্রচার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আর ফজলল করিমের মধ্যে মেহেরুল্লাহ্‌ দেখেছিলেন এক সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক প্রতিভা। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা খুব সুলভ ছিল না বলে তাঁকে উৎসাহিত করা তিনি কর্তব্য মনে করেছিলেন। ফজলল করিমের সর্বপ্রধান কাব্যগ্রন্থ 'পরিত্রাণ' যখন চরম রক্ষণশীল মুসলমানদের নিন্দার বিষয় হয়েছিল, তখন মেহেরুল্লাহ্‌র আগ্রহাতিশয্যেই সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

অতএব, ইসলামের প্রতি গভীর নিষ্ঠাই যে ফজলল করিমের জীবনে প্রধান উপাদান হিসেবে দেখা দেবে, তা স্বাভাবিক। তবে সে ইসলাম যে বিশেষভাবে পারস্যের তত্ত্বচিন্তার লক্ষণাক্রান্ত, এতেও কোন সন্দেহ নেই।

দুই

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই শেখ ফজলল করিম সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম বই 'সরল পদ্য বিকাশ' রচনাকালে তিনি ছিলেন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।[১৩] পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রের হাতে বিকশিত পদ্য যত সরলই হোক না কেন, সাহিত্য-আলোচনায় তাকে টেনে না আনাই ভাল। বইটি ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল কিনা, জানি না। কারণ, ১৩০৭ সালে প্রকাশিত 'তৃষ্ণা' কাব্যকে তাঁর প্রথম গ্রন্থ বলা হয়েছে ঐ কাব্যের ভূমিকায়। প্রকাশক জানাচ্ছেন:

> তরুণ কবির কএকটী ক্ষুদ্র ভক্তি সঙ্গীত প্রকাশিত হইল, তাঁহার দীর্ঘ সাহিত্য সেবার ফল—কবিতাগুচ্ছ—সময়ান্তরে "শেফালিকা" নামে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ সংবাদপত্রিকায় মুদ্রিত হইতেছে, আশা করি তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের অল্লাধিক উপকার হইতে পারে।...বর্ত্তমান পুস্তক তাঁহার প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়াস মাত্র।...

১৩। হাই ও আহসান: পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৪।

ক্রাউন ১/৮ মাপের চব্বিশ পৃষ্ঠার এই চটি বইটিতে (দাম তিন আনা) সতেরোটি গীতিকবিতা সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি সাধক মনসুরের কবিতার অনুবাদ। সুফী কবিতার মতো এই রচনাগুলোয়ও স্রষ্টাকে প্রেমিকারূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভূমিকায় 'ভক্তিসঙ্গীত' কথাটির উল্লেখ না থাকলে অবশ্য রূপকের প্রতি কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হত না এবং এগুলোকে আবেগ-প্রবণ প্রেমের কবিতা বলে মনে করতে কোন বাধা হত না। উদাহরণস্বরূপ 'কেন যাও?' কবিতাটি থেকে উদ্ধৃত করা যাক:

দূরে কেন যাও সরি
আমি যে পরাণে মরি
তা তুমি কি এতদিনে জানিয়াও জান না,
এ হৃদয় কার তরে?
যা দিয়েছি তা তোমারে
অনর্থক হৃদিবনে দাবানল জ্বেল না। [পৃ ৭]

'সমাধি-সঙ্গীত' কবিতাটি তরুণবয়সের ভাবালুতার পরিচায়ক। আঠারো বৎসর বয়স্ক লেখকের 'দীর্ঘ সাহিত্যচর্চা'র একটি মাত্র সুফল আমরা 'তৃষ্ণা' কাব্যে দেখতে পাই: তাঁর প্রকাশভঙ্গীর সারল্য ও বাচনভঙ্গীর প্রত্যক্ষতা। তবে সমসাময়িক সমালোচনায় কথিত 'প্রতি ছত্রে নবীন কবির প্রতিভা বিচ্ছুরিত হইতেছে'[১৪]—মন্তব্যটি অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

ভূমিকায় উল্লিখিত 'শেফালিকা' কাব্যগ্রন্থ বোধহয় অনেক তরুণ লেখকের বিজ্ঞাপিত 'যন্ত্রস্থ' গ্রন্থের মতোই কখনো যন্ত্রের মুখ দেখে নি। সুতরাং, এতে বাংলা সাহিত্যের অল্পাধিক উন্নতি কি হতে পারত, সে সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না।

'তৃষ্ণা' উৎসর্গ করা হয়েছিল ডাক্তার ময়েজউদ্দীন আহমদ ওরফে মধু মিয়াকে, যাঁর সম্পাদিত 'প্রচারক' (১৮৯৯-১৯০২) নামক মাসিকপত্রে তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়মিত প্রকাশ পেত। অনতিবিলম্বে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন

১৪। ইসলাম প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০০, পৃ ১৪০।

আহমদ-সম্পাদিত মাসিক 'ইসলাম প্রচারক' (নবপর্যায় ১৮৯৯-১৯০৬)[১৫] এবং এস. কে এম. মহম্মদ রওসন আলী চৌধুরী-সম্পাদিত 'কোহিনূর' (১৮৯৮-১৯১৫) মাসিকপত্রেও তাঁর রচনা দেখা দিল। আরো পরে, সৈয়দ এমদাদ আলী-সম্পাদিত 'নবনূর' পত্রিকার (১৯০৩-১৯০৬) তিনি নিয়মিত লেখক হয়ে উঠলেন। মোজাম্মেল হক-সম্পাদিত 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায়ও (১৯২০-২১) তিনি নিয়মিত লিখতেন।

'প্রচারকে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ ছোট আকারের ষোল পৃষ্ঠার পুস্তিকা হয়ে (দাম ছ পয়সা) বের হল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, নাম 'মানসিংহ'। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' এটিকে "গদ্যনাটক" বলা হল কেন, আমি তা বুঝতে পারি নি, যেমন বুঝি নি লেখকের পক্ষে বইটি লেখার আবশ্যকতা কি ছিল। 'বঙ্গভাষায় মানসিংহের জীবনচরিত নাই', এই অভাববোধ থেকে তিনি 'কয়েকখানি প্রাচীন ও প্রামাণ্য ইতিহাস অবলম্বনে এই অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সংগ্রহ' অর্থাৎ সংকলন করেন। এটি তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ, যাকে তিনি বলেছেন 'ঐতিহাসিক চিত্র'। সাধুভাষায় লেখা বই, মধ্যে মধ্যে ধ্বনিময় শব্দবহুল বাক্যরচনার চেষ্টা আছে:

> ভারতের রাজনৈতিক গগনে অলক্ষিতে আকবরের দৃষ্টি ভস্মাবৃত অগ্নির মত সুতীক্ষ্ণ আগ্রহে নিক্ষেপিত হইতেছে, সে জ্বালাময় অগ্নি সমুদয় শক্তিকেই গ্রাস করিতেছে, সুতরাং নিশ্চুপ থাকা অর্ব্বাচীনের কার্য্য: অধিকন্তু এই দুর্ভেদ্য কৌশলজাল ছিন্ন করিয়া অতি অল্প ব্যক্তিই মুক্তবন্ধন হইতে পারিবেন। সমুদয় পথ সংকীর্ণ ও কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং আকবর ভিন্ন সুচারুরূপে রাজ্যরক্ষার উপায় নাই। ইতিপূর্ব্বে অনেক রাজপুত কুল-ভাস্কর এ পথ পরিষ্কারও করিয়াছিলেন,—সুতরাং মানসিংহ সম্রাটের এই অমিততেজ অলৌকিক বলের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। [পৃ ৩]

রচনা হিসেবে 'মানসিংহ' সর্বাঙ্গসুন্দর নয়: এই উদ্ধৃতির মধ্যেই 'মত' 'নিশ্চুপ' ও 'পরিষ্কারও' শব্দের অসঙ্গত প্রয়োগ দৃষ্টি এড়ায় না। জীবনী হিসেবেও এটি অসম্পূর্ণ। 'নবনূর' যথার্থ ই বলেছেন:

১৫। প্রথম পর্যায়: ১৮৯১-৯২।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক প্রসিদ্ধ মানসিংহের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু উপযুক্ত উপকরণাভাবে তিনি সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষাও অনেক স্থানে জটিল ও ইতিহাসের অনুপযুক্ত বোধ হইল।...[১৬]

'মানসিংহে'র পরই তাঁর আরেকটি পুস্তিকা বের হল, নাম 'আস্‌বাত-উস্‌-ছামা বা ছামাতত্ত্ব'। সাতাশ পৃষ্ঠার চটি বই, প্রকাশকাল 'সন ১৩১০ সাল, কার্ত্তিক'। এই শাস্ত্রীয় বিতর্কের বইটিকে আখ্যাপত্রে অবশ্য অনূদিত গ্রন্থ বলা হয়েছে। 'চিশ্‌তীয়হ্‌ ও সুহ্‌রওর্দীয়হ্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদের মধ্যে অবিকল কীর্ত্তনের অনুরূপ প্রেম-প্রকাশের ধারা প্রচলিত ছিল—তাহার নাম "সমা" বা "গানের বৈঠক"। কোন বিশেষ বিশেষ দিবসে এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ একস্থানে একত্রিত হইতেন, এবং গান-বাজনার সাহায্যে অন্তরকে উদ্দীপ্ত করিয়া ভগবৎ প্রেমে গড়াগড়ি দিতেন বা নাচিতে থাকিতেন।'[১৭] চিশতিয়াহ্‌ ও সুহ্‌রাওয়ার্দীয়াহ্‌ সম্প্রদায়ের সাধকদের যিকিরের জন্য 'সামা'র ব্যবহার অপরিহার্য ছিল, তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সুফীরাও এর চর্চা করতেন। ধর্মানুশীলনের মধ্যে নৃত্যগীতের সংযোজন ধর্মসিদ্ধ কি না, এ নিয়ে মুসলমান শাস্ত্রকারদের মধ্যে নানারকম তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। আল-গাজ্জালী এর অনুমোদন করেছিলেন। 'সামা'র চর্চা করতেন বলে পরবর্তীকালে অনেক সুফী সম্প্রদায়ই নৃত্যরত দরবেশ নামে পরিচিত হতেন।[১৮] কাকিনা-নিবাসী মৌলভী আবদুল লতিফ নতুন করে আবার এই পুরোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, '(ক) সঙ্গীত ও (খ) বাদ্য—যাহা চিশতিয়া খান্দানের পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, এবং বর্ত্তমানে ভক্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে—ইহা সরাহ অনুসারে সিদ্ধ কি অসিদ্ধ?' তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নয়।

১৬। নবনূর, ফাল্গুন ১৩১০, পৃ ৪৪২।

১৭। মুহম্মদ এনামুল হক: বঙ্গে সুফী-প্রভাব (কলিকাতা: মোহসীন এণ্ড কোং, ১৯৩৫), পৃ ১৬৯-৭০।

১৮। Tarachand: Influence of Islam on Indian Culture (Allahabad: The Indian Press Ltd., 1946) pp 82-83.

এই যুক্তি খণ্ডন করে একটি প্রতিবাদপত্র রচনা করেন মজফ্‌ফরনগর নিবাসী "জনাব, হজরত, মওলানা, হাজি, হাফেজ, কারী, মহম্মদ শাহাবুদ্দিন সাবেরি"। ফজলল করিমের 'ছামীতত্ত্ব' তারই অনুবাদ বা সেই ভিত্তিতে বাংলায় লেখা প্রবন্ধ।

সতেরো বৎসর বয়সে ফজলল করিম গদ্যে 'লায়লী মজনু'র প্রেমোপাখ্যান রচনা করেছিলেন, পরে হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনী অবলম্বনে লিখেছিলেন 'পরিত্রাণ' কাব্য। ১৯০১ সালে 'প্রচারক' পত্রিকায় এ দুটি রচনাই একসঙ্গে প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি যদিও তখন 'ইসলাম প্রচারকে'র নিয়মিত লেখক, তবু তার সম্পাদকের রক্ষণশীল চিত্ত এতে ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে নি। অধিকন্তু, বোধ করি, 'প্রচারকে'র সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার ব্যাপারটিও ইন্ধন জুগিয়ে থাকবে। 'সমাজ-সেবক উচিত বক্তা' নামে তিনি (অন্য কেউও হতে পারেন) অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লিখলেন :

> "প্রচারক" নামক একখানি মাসিকপত্র আছে।... বোধহয় কোন অর্ব্বাচীন প্রতারক লোক সমাজসেবার ভাণ করিয়া প্রতারণার জাল বিস্তার করতঃ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিবার উপায় করিয়া লইয়াছে।... এক শেখ ফজলল করিম ও সম্পাদক ভিন্ন অন্য সমস্ত লেখকই ইসলামবিরোধী কোরাণ অবিশ্বাসী হিন্দু।... শেখ ফজলল করিম সাহেবেরও যে দুইটী প্রবন্ধ "প্রচারকে" প্রকাশিত হইতেছে, তাহার একটী লায়লী মজনুর প্রেমোপাখ্যান, অপরটী কবির কল্পনাপ্রসূত "পরিত্রাণ কাব্য"। ঐ লায়লী মজনুর প্রেমোপাখ্যান পাঠ করিয়া বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ কি শিক্ষা পাইবে?... লায়লীর রূপমাধুরী, অঙ্গসৌষ্ঠব, নয়নভঙ্গী, বিলোল কটাক্ষ, প্রেমকথন ও প্রেমচাতুর্য্য, মজনুর প্রেমাসক্তি ও প্রেমোন্মত্ততা দ্বারা আমাদের পতিত সমাজের কি উপকার হইবে?.. অধুনা আমাদের যে দুই চারিজন নব্য যুবক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, ঐরূপ প্রবন্ধ প্রকাশদ্বারা তাহাদের মাথা খাওয়ার যোগাড় হইতেছে না কি? তারপর পরিত্রাণ কাব্য। ইহার নাম যেমন কাব্য, প্রকৃতপক্ষে কাব্যই। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না; কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করি যে বিষয় অবলম্বনে উহা লিখিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে অসার কল্পনাপ্রসূত কাব্যাকারে প্রবন্ধ লেখার অধিকার কোন মুসলমানের আছে কি?...[১৯]

১৯। ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০২, পৃ ২৬-২৯।

সমালোচকের এই অভিশাপের ফলে কি না, জানি না, 'প্রচারকে' 'লায়লী মজনু' ও 'পরিত্রাণ' সম্পূর্ণ হতে পারল না—রচনা সবটা ছাপা হবার আগেই পত্রিকার আয়ু শেষ হল।

ফজলল করিম এতে অবশ্য বিচলিত হলেন না। বরঞ্চ মুনশী মেহেরুল্লাহ্ স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 'পরিত্রাণ' কাব্য প্রকাশ করায় তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। এটি উৎসর্গ করা হল 'চিশতিয়া খান্দানের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র' মোহাম্মদ শাহ্ শাহাবউদ্দীন চিশ্তি সাবেরি সাহেবকে। ইনিই তাঁদের পরিবারের পীর, লেখকের চোখে 'দেব'তুল্য। তাই তাঁর নিবেদন,

> বড় আশা পাব দেব অন্তিমে তোমার
> চরণ মঞ্জীর।

'গ্রন্থের দুই একটী স্থানে আমি মাইকেল ও নবীনবাবুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছি, এ জন্য তাঁহাদের নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিব'—অবতরণিকায় কবি একথা বলেছেন। এই ঋণ অমিত্রাক্ষর ছন্দগ্রহণে, কতিপয় শব্দপ্রয়োগে, (যেমন, 'আকাশ-সম্ভবা-বাণী' 'বিহঙ্গকুল' 'নীরবিলা' 'কল্লনে লো!' প্রভৃতি) এবং 'কি পাপে দারুণ বিধি তোমার কপালে লিখেছিলা হেন দুঃখ' প্রভৃতি বাক্য বা বাক্যাংশের ব্যবহারে। মাঝে মাঝে অবশ্য তিনি অন্য ছন্দও ব্যবহার করেছেন।

এই কাব্যের বিষয়বস্তু ইসলামপ্রচারের প্রথম পর্যায়ে কোরেশদের বিরোধিতা, নবীর মদিনায় হিজরত, বদর, ওহোদ ও খায়বরের যুদ্ধ এবং মক্কাবিজয়—হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনের এই ঘটনাবলী। এটা যাতে কাব্য হয়ে ওঠে, সেজন্য কবির চেষ্টা ছিল। তাই মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিসর্গবন্দনা আছে, যার অংশঃ

> নিদাঘ-শর্ব্বরী-অন্ত, স্নিগ্ধ সমীরণ
> চুম্বিয়া লতিকা-বক্ষ বহে ধীরি ধীরি
> শান্তোজ্জ্বল পূর্ব্বাসার ভাতিলা পূরবে
> নাশিতে বিশ্বের তমঃ— হাসিলা প্রকৃতি
> আনন্দে দোলায় শির; নিকুঞ্জ বল্লরী
> সে উৎসবে মাতিলেক যেন এ ধরায়
> সুখের স্বপন পেয়ে। [পৃ ৪৯]

অন্যান্য লেখকের মতো তিনিও মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশার জন্য কাতরতা প্রকাশ করেছেন ঃ

কাঁদার সময় আজি হয়েছে মোদের
মোস্‌লেম সন্তান মোরা হেন দীন হীন
ধর্ম্মহারা পথভ্রান্ত অলস অধম
কেবল গণিছি বসি মরণের দিন !
জগতে পতিত বলি ইসলামের নামে
কলঙ্ক দিয়েছি ঢালি অভাগ্য আমরা। [পৃ ৮৪]

মাতৃভাষার অনাদরের জন্যে কবির আক্ষেপোক্তি ঃ

কি পাপে দারুণ বিধি তোমার কপালে
লিখেছিলা হেন দুঃখ বল বঙ্গভাষা,
অনাহারে, অবহেলে,— পরিচর্য্যাভাবে
জীর্ণাশীর্ণা হারায়েছ সকল ভরসা।...
হতভাগ্য বাঙ্গালীর অদৃষ্টের দোষে
তুমি মা কাঙ্গালী আজ আপনার দেশে। [পৃ ৮৩]

'পরিত্রাণ' সম্পর্কে 'নবনূরে'র সমালোচনাকে যথার্থ বলা যায় ঃ

সমালোচ্য কাব্যখানি বাহ্যদৃষ্টিতে সুন্দর হইলেও কবি মোজাম্মেল হকের গ্রন্থাপেক্ষা সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট।... কেবল ব্যবহার-বিরল আভিধানিক শব্দ-সমষ্টি জুড়িয়া দিলেই যদি কাব্য হইত, তবে এই কাব্যখানিও উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইত, সন্দেহ নাই।... লেখক একমাত্র সংযমের অভাবেই স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির অপব্যয় করিয়াছেন, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়।... বস্তুতঃ শেখ ফজলল করিম সাহেবের একটু শক্তিমত্তায় আমরা আশান্বিত হৃদয়ে এতদিন তদীয় গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। তিনি আমাদিগকে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিতেছেন কেন ?[২০]

২০। নবনূর, কার্ত্তিক ১৩১১, পৃ ৩৩৫-৬।

মোজাম্মেল হকের কাব্য[২১] যেখানে শেষ হয়েছে, ফজলল করিমের কাব্যের শুরু সেখানে। 'হজরত মুহম্মদ' কাব্যের প্রথম সর্গে 'মক্কানগরী ও জমজম কূপের কথা' বিবৃত হয়েছে, শেষ (সপ্তবিংশ) সর্গে 'হজরত আবুবকরের ইসলাম গ্রহণ'-এর কাহিনী। ছন্দের বৈচিত্র্যে ও ভাষার পরিচ্ছন্নতায় তাঁর কাব্যটি গুণান্বিত। তবে, এই তুলনার সময়ে একথা মনে রাখা উচিত যে, মোজাম্মেল হকের এটি পরিণত রচনা, আর ফজলল করিমের সাহিত্যসাধনার তখন প্রথম অধ্যায়। তাছাড়া, বিগত শতকের আদর্শে কাব্যকাহিনী রচনার ধারা তখন পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে থাকলেও তা প্রাণহীন গতানুগতিকতায় পরিণত হয়েছিল মাত্র।

সতেরো বৎসর বয়সে যে তিনি 'লায়লী-মজনু' লিখেছিলেন, এতে খুব বিস্মিত হবার কারণ নেই,—শরৎচন্দ্রের দৃষ্টান্ত তো আমাদের সামনেই আছে। রচনাটি পুস্তকাকারে বের হল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। 'সূচনা'য় প্রেম সম্পর্কে যেসব তত্ত্বকথা তিনি বলেছেন, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবধারার না হোক, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিতার প্রভাব আছে:

> ...প্রেমের দুই মূর্ত্তি— সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম প্রেম, রূপজ, মোহজ বা স্বার্থজ। ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক; সুতরাং উপেক্ষনীয়। আর নিষ্কাম প্রেম, খাঁটি জিনিষ। জীবজগৎ এই প্রকার প্রেমে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করুক, ইহাই বিধাতার অভিপ্রেত। [পৃ ।/০]

সুফী ভাবধারার পরিচয়ও সুস্পষ্ট:

> এখানে আমরা নিষ্কাম প্রেমকে সদ্‌গুরুর আসন দিতেছি; কারণ প্রেমের উন্মেষ ভিন্ন মুক্তির পথ অন্ধকার ও বন্ধুর। সেইখান হইতেই মহাপ্রেমের সূচনা ও সম্মিলন বাসনা উদ্রিক্ত হয়। যখন প্রেম-রূপ সদ্‌গুরু হৃদয়ে বসিয়া, সরলতার মধ্য দিয়া ধর্ম্মের মহোচ্চ পথ দেখাইয়া দেয়, তখনই বিশুদ্ধ সত্যের জ্যোতিঃ আসিয়া কাম-রূপ পাপের কালিমাকে আবৃত করিয়া ফেলে। এইখানেই মানবজীবনের দেবত্ব,—এইখানেই অমরত্ব। [পৃ ।৶০]

২১। মোজাম্মেল হক: হজরত মোহাম্মদ (কলিকাতা, ১৩১০; পঞ্চম সংস্করণ, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৩৪২)।

লায়লী-মজনুর জীবনে এই দেবদুর্লভ প্রণয়ের আবির্ভাবকেই তিনি তাঁর রচনায় গৌরবমণ্ডিত করেছেন। এই প্রেমের গভীরতা এবং ভাবতন্ময়তায় নায়ক-নায়িকার বাহ্যজ্ঞানলুপ্তি তিনি বেশ আবেগসহকারে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর সামাজিক মনের ভালমন্দ বোধও সক্রিয় ছিল। বইটিতে স্বকপোলকল্পিত একটি চরিত্র আমদানীর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

> চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা এক নূতন সখীর সরস ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি। আর কোনও ভাষায় "লায়লী-মজনু"তে ইনি বোধহয় এখনও দেখা দেন নাই। মায়ের মুখোমুখী লায়লী প্রেম-ঘটিত গঞ্জনার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন, প্রাচীন লেখকের পক্ষে এ ছবি সঙ্গত বোধ হইলেও, একালে নিতান্ত নির্লজ্জতার পরিচায়ক। তাই আমরা ধরিয়া বাঁধিয়া এক সখী জুটাইয়াছি। [পৃ ॥৹-॥/৹]

প্রকৃতপক্ষে এর কোন আবশ্যকতা ছিলনা। কেননা, বইতে নায়িকা প্রাচীন মাপকাঠিতে এতরকম "নির্লজ্জতা"র পরিচয় দিয়েছেন যে, সমাজ-ও সুনীতি-রক্ষক পাঠকের পক্ষে, মায়ের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটিতে আর নতুন করে মর্মাহত হবার সুযোগ নেই।

লায়লী মজনুর প্রেম যে প্রাকৃত প্রেম নয়, এ কথা বোঝাবার জন্যে লেখক চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। লায়লীকে পাবার জন্য সাধনা করতে গিয়ে মজনু অপার্থিব শক্তি লাভ করেছেন এবং শুধু তাই নয়, শেষ অবধি তাঁর প্রণয় ধাবিত হয়েছে লায়লীকে অতিক্রম করে তাঁর স্রষ্টার প্রতি। তাই লায়লীকে একান্ত কাছে পেয়েও মজনু তাঁকে পিত্রালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং নিজে সমাহিত হলেন পরমপুরুষের ধ্যানে। তাঁর সুফীধর্মী চিন্তার প্রকাশ এখানেও আমরা দেখতে পাই। গ্রন্থের শেষভাগে লায়লীর প্রতি রাজা নওফেলের আকর্ষণকে কেন্দ্র করে নাটকীয় জটিলতা গড়ে উঠতে পারত, সহজ বর্ণনা দিয়ে লেখক সে সুযোগ নষ্ট করেছেন। একটি কৌতুককর বিষয় হল, হজরত মুহম্মদের (দঃ) নামে লায়লীর শপথবানী উচ্চারণ। লেখক তার কৈফিয়ত দিয়েছেন এ ভাবে ঃ

> এই ঘটনা শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের বহু পূর্ব্বের হইলেও, তাঁহার আগমন সংবাদ আদিকাল হইতে ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ ছিল। বিদুষী লায়লীর ইহা জানিবার বাকী ছিল না। [পৃ ৮৩ পা.টী.]

এ যুক্তি এতই অকিঞ্চিৎকর যে মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না।

এই বইটিতে তাঁর রচনা প্রথম দানা বাঁধল। এটি সাধুভাষায় লেখা, প্রায়ই চোখে পড়ে তৎসম শব্দের আধিক্য ও সমাসের আড়ম্বর :

> বসন্তকাল— প্রেম সোহাগ-উদ্বেলিত দিগঙ্গনা নব-সাজে বিভূষিতা। আকাশের চাঁদ, কাননের ফুল, ভ্রমরের প্রেমালাপ, পাপিয়ার অতৃপ্ত সঙ্গীত, বিরহীর নয়নাশ্রু এখন সমস্তই অনিন্দ্যসুন্দর।... রতিপতি কমল-আসনে ফুলশর হস্তে যুগ্ম-নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক কাহারও কোমল প্রাণে শর-সন্ধান করিতেছেন,—সে দৃষ্টি কি ভীষণ! [পৃ ৮]

> অসম্বৃতা লায়লী আলুলায়িতকুন্তলা তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিতা ওষ্ঠাধরা, অর্দ্ধোন্মুক্ত-বক্ষোবাসা, কোটীন্দুকলা-কেন্দ্রিকৃতা, প্রেমিকা-কুল-কিরীটিনী লায়লী সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। [পৃ ৩৬]

সেইসঙ্গে অনুচিত প্রয়োগ ও গুরুচণ্ডালী দোষও দেখা যায় :

> সত্যের জয় অবিসম্বাদী! নতুবা এ পবিত্র প্রেমের প্রীতিদ-তরঙ্গ যুগযুগান্তর ভেদ করিয়া আজ বিশ্বের বিদগ্ধ বক্ষ অভিষিক্ত করিত না। বালুকায় জল ঢালার মত অকালে শুকাইয়া যাইত। [পৃ ২৭]
>
> আমরা গ্রন্থকার। নায়ক-নায়িকার মুখে না কহিবার কথাটাও একবার বাহির করিয়া লই। তা' না'হলে আসর জমে না, পাঠক মজেনা; কিন্তু আমাদের একটা সার্ব্বভৌম আশা আছে। [পৃ ৪৯]

ভাষা ও ভাবঘটিত অনৌচিত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুতর নিদর্শন :

> বিনা তারে টেলিগ্রাম হয়, প্রাণে প্রাণে কথা হয়, ইহার আবার প্রমাণ কি দিব? হৃদয়ের মত টেলিগ্রামের যন্ত্র আজিও জগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? আর চোখের মত অপূর্ব্ব "ক্যামেরা" আজিও কেহ দেখিয়াছেন কি? এ ফটো তুলিবার প্লেট—প্রাণ। [পৃঃ ১৫]

শেখ ফজলল করিমের রচনাভঙ্গীর একটি বড় ত্রুটি এই ধরণের বাল্যকোচিত উক্তি, যা তাঁর পরিণত বয়সের রচনাকেও আক্রান্ত করেছিল। এখানে আরেকটি উদাহরণ দিই। লায়লীর বিবাহ হয়েছে, সেই রাত্রে :

> উদ্‌ভ্রান্ত রাজপুত্র আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না,—আবেগভরে প্রিয়তমাকে বক্ষে জড়াইবার জন্ম হস্ত সম্প্রসারণ করিলেন ; কিন্তু এ কি ? চপেটাঘাত তো প্রেমোপহার নহে ! যে প্রেমরাণীর বিমল সুধার আশায় রাজপুত্রের দগ্ধ হৃদয় এতদিন ছিন্নকণ্ঠ কপোতের মত যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছিল, আজ তাহার এ কি ব্যবহার ! [পৃঃ ৮১]

উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারেও ভাষারীতির মতোই তিনি উনিশ শতকী পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন :

> মেঘাচ্ছন্না রজনীতে সৌদামিনী বিকাশের মত একটু হাসিলেন। [পৃ ৩০]
>
> ঈপ্সিতার মধুর চন্দ্রানন দেখিয়া কএস তৃষিত চাতকের মত জাগ্রত স্বপ্নে ব্যাকুল হইয়া গৃহপানে চলিলেন। [পৃ ২২]
>
> অনন্ত সাগরবক্ষে বাত্যাহত ঊর্মিমালার ন্যায় লায়লী তখন হৃদয়াবেগে পরিচালিতা। [পৃ ৩৯]
>
> যেন পবিত্রতা আসিয়া প্রেমের মন্দিরে প্রবেশ করিল। যেন রাজহংসী আসিয়া কমলবনে প্রবেশ করিল। যেন পুণ্য আসিয়া ধর্ম্মের মন্দিরে প্রবেশ করিল। [পৃ ৩২]

সমাসোক্তির ব্যবহার আছে, তেমনি ছেলেমানুষী করে এমন ব্যবহার নষ্ট করেছেন, তার উদাহরণও রয়েছে :

> তখন গোধূলী সিন্দুর পরিয়া মেঘবালা যেন শ্বশুরালয়ের দিক অগ্রসর হইতেছিল। [পৃ ১৮]

প্রতিবস্তূপমার (Parallel simile) প্রয়োগ এবং আত্মগত উক্তি [পৃ ২৬, ৪৩, ৬৭] বা পাঠক ও পাত্রপাত্রীর উদ্দেশ্যে উক্তিও [যেমন, পৃ ৭১] এতে আছে। সংলাপের ভাষা সাধারণতঃ কথ্য : কখনো কখনো সাধুভাষার সংলাপ আছে এবং কখনো কখনো সাধু ও কথ্য ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে একই সঙ্গে।

,লায়লী মজনু'র পর শেখ ফজলল করিম লিখলেন চিশ্‌তিয়া সাধকদের আদিগুরু 'মহর্ষি হজরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) জীবন চরিত' (১৯০৪)। এ জীবনকাহিনী যে অলৌকিক ঘটনায় আকীর্ণ হবে, তার আভাস পাওয়া যায় ভূমিকা থেকেই :

> বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর লোক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্বাস করিতে চাহেন না ; কিন্তু নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যাঁহাদিগের হৃদয় সর্ব্বশক্তিমান খোদাতা'লার অসীম শক্তির প্রভাবে ক্ষমতাশালী, তাঁহাদিগের পক্ষে সাধারণ মানুষের অসাধ্য কোন আশ্চর্য্য ঘটনাপ্রদর্শন, বিস্ময়ের বা অবিশ্বাসের কথা নহে।

এই 'আশ্চর্য্য ঘটনাপ্রদর্শনে'র মধ্যে আছে একটি শিশুসহ খাজা সাহেবের অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ ও অক্ষত অবস্থায় নিষ্ক্রমণ, তাঁর ইচ্ছায় ছিন্নমুণ্ড ব্যক্তির জীবনলাভ, হজরতের সমাধি থেকে তাঁর প্রতি আহ্বান, তাঁর ইচ্ছায় প্রস্তরমূর্তি কর্তৃক আল্লাহ্‌র জয়গান, তাঁর আদেশে মাতৃগর্ভস্থ শিশুর বাক্যালাপ, প্রতি রজনীতে খাজা সাহেবের মক্কাগমন ও প্রাতে আজমীরে প্রত্যাবর্তন। এইসঙ্গে 'সামা'র পক্ষসমর্থন আছে, আর আছে চিশতিয়া সম্প্রদায়ের গুরুত্বজ্ঞাপনের একটি শস্তা পন্থা। খাজা সাহেব যখন কাবা প্রদক্ষিণ করেন, তখন তাঁর প্রার্থনার উত্তরে নাকি আকাশবাণী হয় যে, 'যে ব্যক্তি চিশ্‌তিয়া খান্দানে মুরিদ হইবে, সে নির্ব্বিচারে বেহেশ্‌তে গমন করিবে' [পৃ ৩৫]।

মোজাম্মেল হকও মঈনউদ্দীন চিশ্‌তীর জীবনী রচনা করেন—তবে অনেক পরে।[২২] তাঁর গ্রন্থেও অতিপ্রাকৃত ঘটনার অভাব নেই। ফজলল করিম পীর সাহেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, মোজাম্মেল হক তাঁর পাদুকার অলৌকিকতা দেখিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু সুফী মতবাদের ইতিহাস ও প্রকৃতি এঁরা কেউই ব্যাখ্যা করেন নি, অথবা, প্রধান প্রধান

২২। মোজাম্মেল হক : খাজা ময়ীনউদ্দীন চিশ্‌তি (ঢাকা : আবদুল আজিজ খাঁ, ১৩২৫)।

সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একমাত্র শাখা (চিশতিয়া) ভারতের মাটিতে বিকাশলাভ করে, তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ বা সম্পূর্ণ পরিচয়দান করতে এঁরা কেউই প্রবৃত্ত হন নি।

'মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আল্‌ফ-সানী' (১৯০৫) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল।[২৩] আলফ-ই-সানীকে তিনি 'নখ্‌শবন্দিয়া ও মোজাদ্দাদিয়া তরিকার প্রদীপ্ত রবিকর' বলে অভিহিত করেছেন। মুজাদ্দাদ-ই-আলফ-ই-সানী শেখ আহমদ সরহিন্দী (১৫৬৩-১৬২৪) যদিও নক্‌শবন্দীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক, তবু ভারতে সুফী মতবাদের প্রধান সংস্কারক এবং সমগ্র মুসলমান সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হিসেবে ইতিহাসে স্থানলাভ করেছেন। সুফীদের তসউফের সঙ্গে ভারতীয় ব্রহ্মবাদের মিলন এবং সামগ্রিকভাবে সুফী চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের ভাবমিশ্রণের ফলে যে সব ইসলাম-বিরোধী মনোভাব ভারতীয় সুফী সমাজে প্রবেশলাভ করেছিল, সরহিন্দী তারই বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন।[২৪] এঁর জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে ফজলল করিম একথা জানাতে ভোলেন নি যে, মুজাদ্দাদ তাঁর জনক হজরত শেখ আবদুল আহাদ চিশতী কুদসীর কাছে চিশতীয়া ও কাদিরীয়া পন্থায় দীক্ষালাভ করেছিলেন, নক্‌শবন্দীয়া ধারায় দীক্ষিত হন পরবর্তীকালে— হজরত বাকীবিল্লাহ্‌র প্রভাবে। এই মহাপণ্ডিতের জীবনকাহিনী বিবৃত করতে যেয়েও তিনি অলৌকিকতার মোহ ত্যাগ করতে পারেন নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরকে প্রণতি জানাতে অস্বীকার করায় মুজাদ্দাদ কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

> প্রবাদ আছে, এই সময়ে হজরতের সিদ্ধ শিষ্য সেবকগণ আধ্যাত্ম শক্তিবলে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত জানিতে পারিয়া, স্বপ্নে তাঁহাদিগের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "ধৈর্য্য ধারণ কর; ইনশা আল্লাহ্‌ আমি শীঘ্রই এখান হইতে মুক্তিলাভ করিব"।[২৫]

২৩। ইসলাম প্রচারক, আগস্ট ও ডিসেম্বর ১৯০৪, জানুয়ারী ১৯০৫।

২৪। মুহম্মদ এনামুল হক: পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪০।

২৫। ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৫, পৃ ৫৯-৬০।

অতঃপর সম্রাট-দুহিতা স্বপ্নে হজরত মুহম্মদের (দঃ) আদেশলাভ করলেন আহমদ সরহিন্দীকে মুক্তিদানের জন্যে। অনুতপ্ত জাহাঙ্গীর তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে মুক্তি দিলেন আর স্বয়ং তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হলেন।

'আফগানিস্থানের ইতিহাস' (১৯০৯) রচনার আশু উপলক্ষ্য ছিল আমীর হাবীবউল্লাহ্ খানের ভারত সফর। বইটি তেমন সুখপাঠ্য নয়, তবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধনে লেখকের আগ্রহের পরিচয় আছে নিম্নোদ্ধৃত অংশে ঃ

> যেদিন দিল্লীতে ঈদের সময় হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দোম্বা কোরবানীর অনুরোধ করিয়া তিনি [আমীর হাবীবউল্লাহ খান] অনন্যসুলভ সাম্যবাদের পরিচয় দিয়াছিলেন, সেদিন কোন রাজনীতিবিদ ব্যক্তি তাঁহার প্রজাপালন নীতির সুস্পষ্ট আভাষ বুঝিতে না পারিয়াছিল। [১০]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে মনোভাবকে ফজলল করিম এখানে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কুড়ি বছর আগে মীর মশাররফ হোসেন সেই একই মনোভাব থেকে তাঁর 'গো-জীবন'[২৬] পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন। এতে কিন্তু গোঁড়া মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, পুস্তিকা-রচয়িতাকে 'কাফের' আখ্যা দিতে এবং তাঁর স্ত্রী হারাম হবার ফতোয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। এমন কি, পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মশহাদীর মতো লেখকও ছদ্মনামে 'অগ্নিকুক্কুট'[২৭] রচনা করে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই সমুদয় বাদ-প্রতিবাদের নিষ্পত্তি হতে মশাররফ হোসেন এবং তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়দেরকে আদালতে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। শেখ ফজলল করিমকে এ বিপদে পড়তে হয় নি। তিনি একজন মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ সমর্থন করেছিলেন বলে কেবল নয়, যুগের ভাবলোকেই কিছুটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিল।

বাঙালী মুসলমানের যে পতন হয়েছে, এটা সে যুগে স্বতঃসিদ্ধ ছিল। এই পতনের একটি কারণও তখন সাধারণভাবে গ্রাহ্য হয়েছিল। কারণটি হচ্ছে,

---

২৬। মীর মোশাররফ হোসেন ঃ গো-জীবন (টাঙ্গাইল ঃ চন্দ্রকুমার সরকার, ১২৯৫)।

২৭। ফকির আবদুল্লা-বিন-এসমাইল অল্ কোরেশী অল্ হিন্দী ঃ অগ্নিকুক্কুট (কলিকাতা ঃ ভারত মিহির প্রেস, ১২৯৬; দ্বি-স শাহানশা এণ্ড কোং, ১৩০৯)।

বাঙালী মুসলমানের আদর্শচ্যুতি। অতএব, তার জীবনে যাতে এই আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে, সে বিষয়ে অনেকেই সচেষ্ট হয়ে পড়লেন এবং এই চেষ্টাটা প্রধানতঃ দেখা দিল আদর্শ পুরুষদের জীবনকাহিনী রচনার মধ্য দিয়ে। 'পথ ও পাথেয়'তে (১৯১৩) শেখ ফজলল করিম এই আদর্শ জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়েছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন:

> সংসারের শত সহস্র আকর্ষণের মধ্যে, সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে, যাহাতে আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে, সকল সময়, সকল অবস্থায় এক করুণাময়ের প্রতি নির্ভর রাখিয়া বাঞ্ছিত "সৌভাগ্যের" অধিকারী হইতে পারি, সেই আশায়, প্রত্যেক মানুষকেই মহর্ষিগণের ব্যবস্থিত "পাথেয়" গ্রহণে শান্তির পথে,—খোদার পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। অন্য পথে শান্তি নাই।

এরপর তিনি বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনে নীতি ও ধর্মনিষ্ঠার নানা দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। ইমাম আহমদ হম্বলের পুত্র উৎকোচের অর্থে ময়দা কিনে পিতাকে উপহার দিয়েছিলেন: সেই ময়দায় তৈরী রুটী গ্রহণ করতে ইমাম সাহেব তো অস্বীকার করলেনই, উপরন্তু যখন সেই রুটী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হল, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, সারা জীবন আর মাছ খাবেন না। প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরি হবার ভয়ে জনৈক মহর্ষি নিজের বাড়ীতে চুরি হতে সাহায্য করলেন। কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে এসে নির্দিষ্ট স্থানে হজরত ইসমাইল দু দশ মিনিট নয়, একাদিক্রমে বাইশ দিন অপেক্ষা করে অঙ্গীকার পালন করলেন। নীতির দিক দিয়ে এগুলো হয়তো খুবই প্রশংসার্হ, এঁদের অসাধারণ চরিত্রবলের প্রকাশ এতে নিশ্চয়ই ঘটেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে এইসব দৃষ্টান্ত অনুসৃত হবে, এমন আশা দুরাশা মাত্র। বরঞ্চ, দু একটি দৃষ্টান্তে, যেখানে প্রতিবেশীর অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় হজব্রতের পুণ্য ঘটল কিংবা রসুলের বাণীতে যেখানে পরাক্রান্ত নৃপতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দণ্ডপ্রাপ্ত হলে তাকে শহীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা-দানের প্রতিশ্রুতি আছে, সেই সব অংশ বোধহয় আমাদের কাছে অধিকতর আবেদন জানায়। অবশ্য লৌকিক জগতের যেসব সুখদুঃখে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটা লেখকের অকাম্য, সেই সুখদুঃখকে স্বীকার না করলে সম্ভবতঃ এই অভাব পূরণের বা এই বিদ্রোহের মাহাত্ম্য স্বীকার করা যায় না।

মোজাম্মেল হকের 'তাপস কাহিনী'র[২৮] সঙ্গে ফজলল করিমের 'পথ ও পাথেয়'র একটি পার্থক্য বোধহয় এখানে। মোজাম্মেল হকের গ্রন্থ পূর্ববর্তী: তপস্বীদের এইসব গুণে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁদের প্রতি লেখকের চিত্ত শ্রদ্ধাবনত হয়েছে, কিন্তু জীবনসাধনার ঋজু পন্থা ত্যাগ করে এইসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে তিনি বলেন নি। এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসেবে 'তাপস কাহিনী' উপাদেয় বই: পতিত জনকে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে সত্যজীবনের আলোকে আনয়নের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হবার কোন দাবী তার নেই।

লিখনরীতির দিক দিয়ে 'পথ ও পাথেয়'র বৈশিষ্ট্য রচনার সংযমে এবং ভাষার আবেগহীন প্রকাশে। এর ভাষা যুক্তিবাহী গদ্যধর্মী, বর্ণিত উপাখ্যান-গুলোকে পল্লবিত করবার কোন প্রয়াস এতে নেই।

'চিন্তার চাষ' (১৯১৬) একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতি উপদেশমূলক রচনার সমষ্টি।

'বিবি রহিমা'কে (১৯১৮) লেখক বলেছেন 'ঐতিহাসিক চিত্র'। এটি ঠিক জীবনকাহিনী নয়, হজরত আইউব ও বিবি রহিমার দাম্পত্য জীবন এতে বর্ণিত হয়েছে। তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি "বিষয়টিকে সুখপাঠ্য এবং সময়োপযোগী করিবার জন্য একটু উপন্যাসের রসে রসাইয়া" দিতে চেয়েছেন। চরিত্র, ঘটনা ও সংলাপ এতে আছে: উপন্যাসের সঙ্গে ঐক্য এটুকুই।

পাত্রপাত্রীর বংশপরিচয়দানের আবশ্যকতা বোধ করে লেখক শুরু করেছেন হজরত আদম থেকে এবং তাঁর বেহেশ্‌ত বাসের সময় থেকে। বইয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়েই এই পরিচয় চলেছে। পিতামাতার শিক্ষায় বিবি রহিমা শৈশব থেকেই আদর্শ চরিত্র হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। মানবীয় দুর্বলতা হজরত আইউবের চরিত্রেও একবার দেখা দিয়েছে, শয়তানের চক্রান্তে পড়ে তিনি অন্যায় প্রতিজ্ঞা করেছেন। কিন্তু বিবি রহিমা আপাদমস্তক আদর্শ রমণী। সংসারের প্রলোভন, শয়তানের চক্রান্ত, সপত্নীদের হিংসা, প্রতিবেশীদের আচরণ,

২৮। প্রথম প্রকাশ 'তাপস জীবনী' নামে (কলিকাতা: লতিফ প্রেস, ১৩০৭)।

আল্লাহ্‌র পরীক্ষা, স্বামীর জ্বরা, দারিদ্র্যের জ্বালা—কিছুই তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারে নি। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি তাঁর অটুট রয়ে গেছে। সেই সঙ্গে তাঁর অপূর্ব বিনয় অবিচলিত আছে ঃ

> আইউব বল্লেন,—"রহিমা! পরশ পাথরের স্পর্শ পেলে নীরস লৌহখণ্ডও স্বুবর্ণে পরিণত হয়; তোমার মত সাধ্বী রমণীর স্বামী হয়ে আইউবের জীবনও ধন্য হয়েছে; পরশ পাথরের মত তুমি তার অন্তরের মলিনতা ঘুচিয়ে তাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তুমি মহিমময়ী;—তোমার পবিত্র আদর্শ জগতের ঘরে ঘরে অনুকৃত হবে।"
>
> করুণাময়ী রহিমা কুণ্ঠিত হয়ে বল্লেন,—"নাথ! রাক্ষসীকে দেবী বলছ? পিশাচীকে হুর বলছ? আমার পাপেই তো তোমার এই কষ্ট। আমি যদি তোমার উপযুক্ত সহধর্মিনী হতে পারতেম, তাহলে কি তোমাকে এত দুঃখ পেতে হয়!—এ সবই আমার কপাল।"
>
> আইউব ব্যাকুলভাবে বল্লেন,—"না, রহিমা। এ তোমার ভুল বিশ্বাস। তুমি স্বর্গের হুর,—আমার জন্য তুমি অশেষ যাতনা ভোগ করেছ;—আমাকে ক্ষমা ক'রো। তোমার প্রসন্ন মুখ দেখতে পেলে আইউব শান্তিতে মরতে পার্ব্বে।" [পৃ ১৩৬]

আসলে দোষ অবশ্য রহিমার নয়, আইউবেরও নয়। শয়তানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আল্লাহ্‌ এ*দের ভক্তিপরীক্ষার জন্যে নানারকম দুর্দশার সৃষ্টি করছেন।

'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন গৃহে গৃহে অমৃত ফলার আশা প্রকাশ করেছিলেন, 'বিবি রহিমা'র লেখকও তেমনি গৃহে গৃহে আদর্শ স্ত্রী ফলার আশা প্রকাশ করেছেন। বইয়ের মুখবন্ধে তাই এর moralটিকে তিনি ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

> শয়নে স্বপনে সতি! পতি-পদে রাখ মতি;
> পতিসেবা, পতিভক্তি নারীধর্ম্মসার।
> পতির চরণতলে স্বরগ তোমার॥

স্বামীসেবায় রহিমার চরমোৎকর্ষলাভের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক প্রায়ই তাঁর চারপাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। ফলে, আমাদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু reflection এতে—এবং কেবল এই বইটিতেই—ধরা

পড়েছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা [পৃ ৪৯-৫০], বাল্যবিবাহের কুফল [পৃ ৫২-৫৩], বিবাহে পণপ্রথা [পৃ ৫৭-৫৮], সপত্নীদের আচরণ [পৃ ৬৯-৭০] সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য থেকে মোটামুটী একটা পরিচ্ছন্ন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। একালের মেয়েদের শ্রমবিমুখতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য কৌতুকজনক :

> বড় লোকের বড় আদরের—বড় সোহাগের মেয়ে রহিমা; কিন্তু তা বলে তোমরা মনে ক'রো না যে রহিমা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান, — ইজি চেয়ারে সিগারেট মুখে কেবল নভেল পড়েন! হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বড়লোকের মেয়েরা সাধারণতঃ গরীব-দুঃখীকে অহঙ্কারে কথা বলেন না,— দেমাকে তাঁদের মাটিতে পা পড়ে না,—লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতেও যেন তাঁদের মান যায়,—কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় অভিমাম করেন,— যাকে-তাকে কটুকথা বলেন, পশুপক্ষীকে যাতনা দিয়ে আমোদ উপভোগ করেন; কিন্তু রহিমা ছিলেন ঠিক এর বিপরীত। [পৃ ৪৬-৪৭]

'বিবি রহিমা'কে লেখক 'নারী-সাহিত্য' বলে অভিহিত করেছেন। শিশু সাহিত্যিকমাত্রই যেমন শিশু নন, তেমনি নারী-সাহিত্যিক পুরুষও হতে পারেন : সে বিষয়ে আমরা সঙ্গতভাবে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে পারি নে। "স্ত্রীলোক-দিগের নিমিত্ত প্রকাশিত" 'মাসিক পত্রিকা'র ভাষাকে প্যারীচাঁদ যেমন সহজবোধ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন, ফজলল করিম তেমনি সবকিছু বড় সহজ করে বোঝাতে গেছেন। ফল কিন্তু এক হয় নি। প্যারীচাঁদ যেখানে বাংলা গদ্যরীতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন, সেখানে ফজলল করিমের রচনায় মাঝে মাঝে বালসুলভ চপলতা দেখা দিয়েছে। যেমন :

> সে [নমরুদের চাকর] রাগের মাথায় একবার হাতুড়িটা তুলে এমন জোরে কষে দিল "ঠক্কাস" যে, সেই আঘাতে বাদশার মাথার খুলিটা একেবারে পাকা বেলের মত পট্টাস। [পৃ ২১-২২]

কিংবা,

> সেকালের ধর্মহীন লোকদিগকে সুপথ দেখানোর জন্য খোদাতা'লা তাঁকে [আইউবকে] পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেছিলেন। এই "প্রেরণ" অর্থে তোমার এ মনে ক'রো না যে, খোদাতা'লা তাঁকে আকাশ থেকে ধপ্ করে ফেলে দিয়েছিলেন। [পৃঃ ৬০]

কিন্তু এর চেয়েও দুঃখজনক বোধ এই অংশটি ঃ

> হজরত আইউবের চৌদ্দ ছেলে-মেয়ে। তারা সব ভাই বোন এক জায়গায় বসে হাসি-খুশী করে আহার কচ্ছিল। কেউ খাচ্ছে, কেউ গল্প কচ্ছে, কেউ মুখের কাছে আহার তুলেছে, এমন সময় পাপের সহচরেরা এসে একটা প্রকাণ্ড পাঁচীর ভেঙ্গে তাদের উপর ফেলে দিল—তারা সব টুপ্ টুপ্ করে মরে গেল। [পৃ ৯৯—১০০]

যেখানে একটি ট্র্যাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা চলত, সেখানে এই 'টুপ্ টুপ্ করে মরে' যাওয়ার বর্ণনায় লেখকের নির্লিপ্ততাকে প্রশংসা করা যায় না, তাঁর সুযোগগ্রহণে অক্ষমতার কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

সেকালের সমালোচনায় 'বিবি রহিমা'র প্রশংসা করা হয়েছিল এর নীতিবোধের জন্যে আর ভাষার প্রাঞ্জলতার জন্যে। দুইই সত্য। ইবসেনের নোরাকে তার স্বামী যেকথা বলেছিলেন Before all else you are wife and mother, সেখানে mother-এর বদলে আল্লাহ্‌র ভক্ত জুড়ে দিলেই এই নীতির স্বরূপ বোঝানো যায়। আর ব্যবহারিক জীবনে এই নীতির প্রয়োগ কিভাবে করা যেতে পারে, রহিমার জীবন কাহিনী দিয়ে এবং নানা রকম নীতি উপদেশ দান করে লেখক তা স্পষ্ট করে তুলেছেন। আদর্শবাদের চাপে তাঁর অঙ্কিত চরিত্রসমূহ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে হয়েছে বর্ণহীন, তাদের মানবীয় আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়েছে, নীতিকথা বলার আগ্রহাতিশয্যে তেমনি অনেক সময়ে তাদের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়েছে। রহিমার পতিগৃহে যাত্রার সময়ে তাঁর পিতার চার পৃষ্ঠাব্যাপী অনর্গল উপদেশ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। চার পৃষ্ঠার অন্তে তাঁর কণ্ঠ যদি বাষ্পরুদ্ধ না হত, তবে অনায়াসে তা আরো চার পৃষ্ঠা চলতে পারত।

অন্যদিক দিয়ে 'বিবি রহিমা'র প্রশংসা করতে দ্বিধা হতে পারে না। কাহিনী পাঠক-চিত্তকে আকর্ষণ করে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়। প্রাঞ্জল ও লালিত্যময় কথ্য ভাষায় বইটি লেখা হয়েছে ঃ রচনার একটা সাবলীল গতি আছে। রচনারীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে Parallel simileর ব্যবহার ঃ

> সোনার সহিত সোহাগার মত, ফুলের সহিত সুবাসের মত, রূপের সহিত গুণের মত, আইউবের চরিত্রে ধর্মের বিমল মাধুর্যও ফুটে উঠেছিল। [পৃ ৬৩]

সমাসোক্তির ব্যবহার (রূপক-সহযোগে) ঃ

> জ্যোৎস্নার সাগরে সাঁতার দিয়ে সিক্তকেশা ধরণী সবেমাত্র চুল শুকাবার জন্য মুক্ত বাতাসে খোঁপা খুলে দাঁড়িয়েছে। [পৃ ৮৩]

যমকের প্রয়োগ ঃ

> তাই খুব আহ্লাদ করেই আমরা ফল খেলেম। ফলের শেষে ফলটা যে কি রকম দাঁড়াবে, তা তখন ভেবে দেখলেম না। [পৃ ৬]

'বিবি ফাতেমা'ও (১৯২১) কথ্যরীতিতে লেখা। ভাষা সহজ, সরল, অনাম্বর, আবেগপ্রবণ এবং সাংগীতিক ব্যঞ্জনাময়। যেমন,

> হজরত এলেন, নির্ম্মল চাঁদের মত স্নিগ্ধ আলোক ছড়িয়ে। পাপী-তাপীর বন্ধু এলেন—ভেসে যাওয়া লোকগুলির প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রেমের তরণী বেয়ে। মর্ম্মে মর্ম্মে ঝঙ্কারিত ক'রে—কর্ম্মের আলোকে সকল পথ সুগম ক'রে দিয়ে—সাম্য মৈত্রীর পতাকা দুলিয়ে—তপ্ত মরুতে শীতল জলধারার মতই তিনি এসে উপস্থিত হ'লেন। মানুষের কল্যাণের জন্য এলেন, অনুতপ্তের চোখের জল মুছাতে তিনি এলেন। বন্দীর প্রাণ আনন্দে নেচে উঠ্‌ল, হতাশের প্রাণ আশায় বাঁচল, রুগ্নদেহে শক্তি সঞ্চারিত হ'ল, নীরস কঠোর চিত্তশিলা, গলে জল হয়ে গেল। যেহেতু তিনি বন্দীর মুক্তিদাতা, হতাশের আশা, নষ্ট স্বাস্থ্যের নূতন রক্তকণিকা, কঠিন শিলার উগ্র দ্রাবক। তাঁকে পেয়ে সকলের আশা মিটল, তাঁকে দেখে সকলের বিষাদ ঘুচল, বন্ধুরূপে, ত্রাতারূপে বৈদ্যরূপে, সান্ত্বনারূপে তিনি এলেন। [পৃ ২২—২৩]

বইটির প্রতি অধ্যায়ের প্রথমে চার চরণের স্বরচিত কবিতা যোজিত হয়েছে। গ্রন্থ শুরু হয়েছে হজরত মুহম্মদ (দঃ) ও বিবি খাদিজার বংশপরিচয় দিয়ে। এখানেও লেখক মাঝে মাঝে উপন্যাসের রস দিতে চেয়েছেন। নফিসার মুখে বিবি খাদিজার বিবাহপ্রস্তাব শুনে হজরত বিশ্বাস করেন নি। তখন,

> বিবি খাদিজা, নফিসার মুখে সব কথা শুনে হজরতকে ডেকে পাঠালেন। হজরত গেলে বল্লেন,—"আপনি কি নফিসার কথায় অবিশ্বাস করেছেন? মনে করেছেন, আমার ধন আছে, আমি ধনীর ছেলেকে বিয়ে করবো? না, না, ভুল বুঝেছেন। আমি ধন চাই নে—আপনার নির্ম্মল মনের তুলনায় সে ধন যে ধনই নয়। যে ধন আপনার আছে, পৃথিবীতে সকলের তা থাকে না। আপনি দুঃখিনীকে চরণে ঠাঁই দিন, এই আমার প্রার্থনা। [পৃ ৭]

এর উত্তরে হজরতের মুখ দিয়ে অবশ্য উপন্যাসের নায়কের মতো উক্তি করাতে লেখক সঙ্কোচ বোধ করেছেন। তাই,

> হজরত মাথা নীচু ক'রে বল্লেন—আচ্ছা, আমি চাচাজীকে জিজ্ঞেস ক'রে কাল আপনাকে আমার মতামত জানাব। [পৃ ৮]

নবীনন্দিনীর জীবনকথা বলতে গিয়ে লেখক নবীর মহিমাই বেশী করে স্মরণ করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ

> অসাধারণ মানুষ যাঁরা, তাঁরাও ঠিক এই সূর্য্যেরই মত। তাঁদের আশেপাশে আর আর চরিত্রও যেন সূর্য্যের পাশে লণ্ঠন আলোর মতই ম্লান—দীপ্তিহীন হ'য়ে যায়। [পৃ ৪৭]

এখানেও তাই হয়েছে। বইটিতে ফাতেমার কথা বেশী, না তাঁর জনকের কথা কথা বেশী, তা বলা দুষ্কর। ফাতেমার চরিত্রটিও হজরতের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন যে, তার স্বতন্ত্র বিকাশ হয় নি—হজরত-চরিত্রের একটি উপগ্রহ বলে তাঁকে মনে হয়। ফাতেমার মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্যে লেখক হজরত আয়েশা বা বিবি খাদিজার চেয়েও তাঁকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন; কোন চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এটি বোধহয় একমাত্র পন্থা নয়। সকল জীবনীকারের মতো ইনিও সাধারণ ও তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যত মাহাত্ম্য লক্ষ্য করেছেন।

যে মহিলা সম্প্রদায়কে 'আনন্দ, শিক্ষা এবং তৃপ্তি'দানের জন্যে এই গ্রন্থের অবতারণা, তাঁদের জন্যে, বিশেষ করে, ফাতেমার পতিগৃহে যাত্রার সময়ে হজরতের বারোটি উপদেশ মূল্যবান। কৃচ্ছ্র সাধনার পরাকাষ্ঠা ফাতেমার জীবনে আছে, তাঁর ধর্মপ্রাণতার তুলনাও বিরল।

'রাজর্ষি এবরাহীম' (১৯২৪)-কে শেখ ফজলল করিমের শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে। তার প্রধানতম কারণ এই যে, এ বই কেবল রাজর্ষি এবরাহীমের (মৃত্যু আঃ ৭৭৭ খৃষ্টাব্দ) কাহিনী নয়ঃ বইয়ের দুই-তৃতীয়াংশ কি তার চেয়েও বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে তপস্বী আদহামের কাহিনী এবং সেই কাহিনীই অধিকতর চিত্তাকর্ষক। আদহাম ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ দরবেশ, অপার্থিব প্রণয়ে বিভোর, নিত্যবস্তুর সন্ধানে হৃতজ্ঞান। আকস্মিকভাবে বলখ-

রাজনন্দিনীর অপূর্ব রূপলাবণ্য দর্শন করে তাঁর চিত্তবৈকল্য ঘটল এবং একইরকম নিষ্ঠা নিয়ে সেই রমণীকে লাভ করবার সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। এই ঘটনাটির মধ্যে যে human interest আছে, তা সত্যিই মূল্যবান। আধ্যাত্মিক জীবনসাধনা থেকে পার্থিব জীবনে ফিরে আসার দৃষ্টান্ত আমাদের 'গোরক্ষবিজয়ে'ও আছে। কিন্তু মীননাথের সেই "পতনের" পেছনে ছিল দেবীর অভিশাপ; তাঁর ভোগলালসা বিকৃতিরই নামান্তর। আদহামের প্রেমে বরঞ্চ সুস্থ, সবল কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় আছে। তাঁর ভক্তজীবন ও প্রেমিক জীবনে চিরবিচ্ছেদ ঘটে নি, একই সূত্রে তিনি দুই জীবনকে গ্রথিত করেছিলেন। সুফী সাধকের ভাবতন্ময়তার সঙ্গে প্রেমিক হৃদয়ের অতলস্পর্শী গভীরতা যুক্ত হয়ে তাঁর চরিত্রটিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আর সে চরিত্র অঙ্কনেও লেখক তাঁর সকল ক্ষমতা নিয়োগ করেছিলেন।

মোজাম্মেল হকও ইবরাহীম ইবনে আদহামের সাধনকাহিনী বিবৃত করেছেন,[২৯] কিন্তু তাঁর পিতার এই পার্থিব জীবনের প্রতি কোন ইঙ্গিত করেন নি। ইবরাহীমের জীবনী বর্ণনায় উভয়ে একই ধরণের উপাখ্যান প্রায় একই ধরণের ভাষায় বিবৃত করেছেন। সুফী ঐতিহ্যের সঙ্গে এঁদের বর্ণিত কাহিনীর কোথাও কোথাও অসঙ্গতি আছে। যেমন, ফরিদউদ্দীন আত্তারের 'তাজকিরাতুল আউলিয়া'য় ইবরাহীমের বল্‌খ রাজ্যত্যাগের কাহিনীটি যেভাবে বলা হয়েছে, ফজলল করিম—মোজাম্মেল হক সেভাবে বলেন নি। এঁদের কথিত কাহিনীটি সকলেই অবগত আছেন: প্রাসাদের ছাদে কে হারানো উট খুঁজতে এসেছিল এবং কে নাকি রাজপ্রাসাদকে পান্থশালা বলে অভিহিত করেছিল, এরই প্রতিক্রিয়ায় সম্রাট হলেন মহর্ষি। আত্তারের বইটিতে স্বয়ং ইবরাহীম-আদহামের জবানীতে কাহিনীটি বলা হয়েছে: একদিন তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন, এমন সময়ে কে এনে দিল এক দর্পণ; সেদিকে তাকিয়ে নিজের গন্তব্য তিনি দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন নিজের সমাধি, যেখানে কোন

২৯। তাপস-কাহিনী।

বন্ধু নেই—স্বজন নেই,—আর সেই পথও দুস্তর অথচ পথচলার পাথেয় তাঁর নেই। এক ন্যায়পরায়ণ বিচারককে তিনি দেখতে পেলেন, মনে হল তাঁর স্বপক্ষে কোন দলিল নেই আর অমনি নিজের কাছেই সাম্রাজ্য হয়ে উঠল বিস্বাদ।[৩০]

ইবরাহীম ইবনে আদহাম যদিও প্রথম যুগের খ্যাতনামা সুফী সাধক এবং সারা জগতে আলোচনার বিষয়, তবু আদহামের বিচিত্র জীবনকাহিনীর তুলনায় তাঁর উপাখ্যান বর্ণহীন বললে ভুল হবে না—অন্ততঃ বাংলায় আমরা যেভাবে এ কাহিনী পেয়েছি, তা থেকে এই ধারণাই জন্মায়। মানুষের রিপুর যে স্বীকৃতি আদহাম-চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে, তার প্রবল অস্বীকৃতিই ইবরাহীমের বৈশিষ্ট্য। রাজ্যত্যাগী ঋষির হৃদয়ে পুত্রস্নেহ যখন প্রবল হয়ে দেখা দিল, তখনই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে পুত্রের জীবনাবসান কামনা করলেন আর—সেই পুত্রের জননীর উপস্থিতিতেই—তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হল। এ ঘটনা অলৌকিক শক্তিলাভের চরম নিদর্শন সন্দেহ নেই, এতে আমরা বিস্ময়ে আপ্লুতও হতে পারি; কিন্তু ধূলায় লুণ্ঠিত জননীর কাতর আর্তনাদের মধ্যেই আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এই উপাখ্যানে mystic element আরো আছে, তার মধ্যে একটি হল খাজা খেজেরের চরিত্র।[৩১]

'রাজর্ষি এবরাহীমে' লেখক সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন (এটি লেখা হয় ১৯১৯ এ), এমন কি, অধিকাংশ সংলাপই—ক্রিয়াপদের দিক দিয়ে—সাধু ভাষায় লেখা। সংলাপ অবশ্য মাঝে মাঝে বড় দুর্বল—বিশেষ করে, কথ্যভাষার ঢং আনার চেষ্টা যেখানে হয়েছে। যেমন, বল্‌খের উজীর রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী ফকীরকে ভর্ৎসনা করছেন:

৩০। quoted in E. G. Browne: A Literary History of Persia (Cambridge: University Press, 1951 edn.), 1, 425.

৩১। কোরআনের একটি সুরায় (সুরা ১৮; The Koran, trans. Rodwell, "Everyman's Library", p 180) এঁর উল্লেখ আছে বলে মনে করা হয়। তবে চরিত্রটি বিশেষ করে পারস্যের সুফীদের কল্পনাকে আকৃষ্ট করেছিল বলে তাঁদের রচনাবলীর মাধ্যমে সাধারণের চেতনায় জীবন্ত হয়ে আছে। দেশভেদে এঁর রূপান্তরও ঘটেছে।

> যদি মঙ্গল চাও, তবে সোজা পথে প্রস্থান কর। কেন, গাছতলা বুঝি আর পছন্দ হয় না? গেরুয়ায় বুঝি আর সাধ মিটে না? "জামাইবাবু" সাজিবার বড় আগ্রহ যে! [পৃ ৭১—৭২]

এ সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে, 'রাজর্ষি এবরাহীমে'র ভাষা ললিত, মধুর ও বেগবান: সাংগীতিক ব্যঞ্জনা ও ভাবাবেগময়তা এর বৈশিষ্ট্য। যেমন,

> বিধাতার লীলা চিরদিনই দুর্জ্ঞেয়। অগ্নিময় বিজনমরুতে সুরসাল পান্থপাদপ যাঁহার অসীম করুণার নিদর্শন, বন্ধুর পর্বতগাত্রে সুশীতল নির্ঝরিণী যাঁহার অপূর্ব মাহাত্ম্যের পরিচায়ক, তাঁহার ভাব কয়জনে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? [পৃ ৩-৪]
>
> ফুল দেখিয়া মানুষ মোহিত হয়, আগ্রহভরে হস্ত সম্প্রসারণ করে; কেন বলিতে পার কি? আগুন দেখিয়া ব্যাকুল পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে ছুটিয়া আসে,—মরণের মাঝেও সে সুধা অন্বেষণ করে; কেন বলিতে পার কি? ফুলে কি চুম্বকশক্তি আছে? আগুনে কি শৈত্য আছে? কোন্ মোহে মানুষ মজে? পতঙ্গ আত্মবিসর্জ্জন করে? শান্ত এবং রুদ্র, কোমল এবং কঠোরের অন্তরালে থাকিয়া কে এমনভাবে তাহাদের ব্যাকুল হৃদয়কে টানিয়া লয়? [পৃ ৫]

ফজলল করিমের গদ্যরচনার সবচেয়ে পরিণত রূপ বোধহয় এ বইটিতেই ধরা পড়েছে। তবে এ ভাষার এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, যা মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক বা এয়াকুব আলী চৌধুরীর রচনায় পাওয়া যায় না।

ঘটনার গতি রুদ্ধ করে এই বইতে তিনি প্রাসঙ্গিক চিন্তা সন্নিবেশ করেছেন— এবং একটু বেশী মাত্রায় করেছেন। এর উদাহরণ:

> দাম্ভিক মানুষ! অত্যাচারী মানুষ! দেখ, দেখ, মানবদেহের পরিণামের দিকে একটীবার ফিরিয়া দেখ। তোমার জীবনের গতি ফিরিতে পারে, চরিত্রের হীনতা দূর হইতে পারে, হৃদয়ের মলিনতা ঘুচিতে পারে,— এই তোমার পরিণাম! ধনের মাদকতায় মনের প্রজ্ঞাহারা তুমি,— এই তোমার চরম গতি! ধনী-নির্ধন সকলকেই একদিন এই পথে গমন করিতে হইবে, এই শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে,—এইখানে আসিয়া বুভুক্ষিত কীটকুলের ভক্ষ্য

> হইতে হইবে,—সেদিনের আর বিলম্ব নাই! জীবন-সঙ্গিনী প্রেয়সী, প্রাণাধিক পুত্র-কন্যা, হিতার্থী বন্ধু-বান্ধব কেহই সেদিন তোমার সহযাত্রী হইবে না; একা-একা—নিতান্তই তুমি একা পড়িয়া রহিবে। [পৃ ৮৩-৮৪]

অবশ্য এটি তাঁর নিজস্ব রীতি নয়। পাঠককে উদ্দেশ্য করে বা আত্মগতভাবে এই ধরণের ভাবপ্রকাশ প্রথম বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই দেখা দিয়েছিল। পরে, মশাররফ হোসেন এর যথেষ্ট চর্চা করে গেছেন 'বিষাদ সিন্ধু', 'গাজী মিয়ার বস্তানী' ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়। ব্যাপারটি যে সব সময়ে উপাদেয় হয়, তা নয়: 'রাজর্ষি এবরাহীমে'ও সর্বত্র তা শোভন হয় নি। তবে মোটের উপর, যে ভাবুকতার পরিচয় রাখতে লেখক ইচ্ছা করেছিলেন, তাতে তিনি সফলকাম হয়েছেন।

বল্‌খ-অধিপতি ও তাঁর দৌহিত্র ইবরাহীমের মিলনের দৃশ্যটিতে 'শকুন্তলা'র দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর শিশুপুত্রের মিলনদৃশ্যের সক্ষম অনুকরণ আছে।

এরপর তাঁর যে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম 'বিবি খাদিজা' (১৯২৭): এটি রচিত হয়েছিল ১৯২৪ সালের মধ্যেই। বর্ণিতব্য চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> খাদিজা ছিলেন এক সওদাগরের মেয়ে। সওদাগর বলতে তোমরা যা বোঝ, তা নয়। তিনি পিঠে বোচ্‌কা নিয়ে কাবুলীদের মতন গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি করে বেড়াতেন না,—তিনি ছিলেন দুচার লাখ টাকার মানুষ। [পৃ ১-২]

এইরকম ব্যাখ্যার একটাই কারণ হতে পারে: এ বই তিনি লিখেছিলেন. মেয়েদের জন্যে আর তাঁদের কল্পনাশক্তি সম্পর্কে লেখকের ধারণা একটু সংকীর্ণই ছিল। প্রচলিত ছাঁদে লেখা এই জীবনীটিতে একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি আছে:

> বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকায় সমাজ ধর্ম্ম দুইই রক্ষা পেয়েছে। নতুবা সমাজের অবস্থা আজ অন্যরকম হয়ে দাঁড়াত। [পৃ ৭৩]

এই উক্তির পেছনে সেকালের সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব আছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্যে মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌ রীতিমতো প্রচার করতেন। হিন্দু

বিধবার পুনর্বিবাহের সুপারিশ করে তিনি 'বিধবাগঞ্জনা' নামে একটি বই লিখেছিলেন গত শতকের শেষে। 'ইসলাম কৌমুদী'তেও তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শেখ আবদুর রহিম-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকরে' মন্তব্য করা হয় যে, 'তাঁহার অসাধারণ চেষ্টায় মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন হইয়াছিল।'[৩২] দেখা যাচ্ছে, ফজলল করিম সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ফজলল করিমের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে 'গাথা' নামে একটি কাব্য এবং 'হাতেম তাই'য়ের গদ্য-উপাখ্যান। ছোটদের জন্যে দুটি জীবনচরিত তিনি রচনা করেছিলেন: 'সোনার বাতী' হজরত আবদুল কাদির জিলানীর জীবনী, 'হারুণর রশীদের গল্প' ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্রাটের কাহিনী।

তিন

শেখ ফজলল করিমের আরো অনেক রচনা সাময়িকপত্রের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। এখানে কয়েকটির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

'ইসলাম-প্রচারকে'[৩৩] ধারাবাহিকভাবে বের হয়েছিল 'ভগ্নবীণা বা ইসলাম চিত্র' কাব্য। প্রথম কিস্তিতে গদ্যে লেখা অবতরণিকা বের হয়: তারপর আট চরণের প্রতি স্তবকের ৫৭ স্তবকে সম্পূর্ণ কাব্যটি প্রকাশ পায়। এর বিষয় ইসলামের এককালের উন্নত অবস্থার স্মৃতি, সেই তুলনায় বর্তমান পতনের উপলব্ধি এবং পুনর্জাগরণের আহ্বান:

সভ্যতা-শিরসে যে ইসলাম বিরাজে
সে বাদশা-জাতি ফকির সাজে
স্মরিলেও কথা বুকে শেল বাজে
গোলামী হয়েছে জীবন সার।

৩২। শেখ হবিবর রহমান: কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা (কলিকাতা: মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯৩৫)-তে উদ্ধৃত।

৩৩। মে-জুন ১৯০২, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০৩।

রুদ্রমন্ত্রে নেচে হুহুঙ্কার রবে
আয় আয় তোরা চল্ যাই তবে
ইসলাম-পতন কেমনে দেখিবে
কেমন রে বসিয়া রয়েছ আর।

কৌতুহলের বিষয় এই যে, এর অব্যবহিত পরবর্তীকালে রচিত প্রবন্ধে তিনি এই ধরণের মনোভাবের সমালোচনা করেছেন ঃ

> "পতিত মুসলমান" নামটা আমরা অনেকদিন হইতেই পাইয়াছি। কবির কাব্যে, বক্তার গলাবাজীতে, লেখকের মসীলেপনের আড়ম্বরে এবং সমাজের সাধারণ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ধারণাটাও জন্মিয়া গিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে,— এই "পতিত" নামটা আর কতদিন থাকিবে ?—এখন কেমন করিয়া আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে— তাহাই বিচার্য।[৩৪]

এর উত্তরে তিনি বলেছেন যে, বাঙালী মুসলমানের উন্নতির জন্যে প্রয়োজন বিদ্যাশিক্ষা, আর্থিক উন্নতি, ধর্মনিষ্ঠা এবং একতা।

'সিপাহী যুদ্ধের বীরগাথা' নামে বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা কুমার সিংহ সম্পর্কে লেখা একটি হিন্দী ছড়াও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।[৩৫]

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পামার-অনূদিত 'হারুণ অল রশীদ' গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ অবলম্বন করে তিনি 'আল হারুণ বা বোগ্‌দাদাধিপতি মহামান্য খলিফা হারুণ অল রশিদের বিস্তৃত জীবনচরিত' সংকলন করেন।[৩৬] এজন্যে অন্যান্য ইতিহাসও তিনি দেখেছিলেন। হজরত মুহম্মদের (দঃ) জন্মের পূর্বে আরবের অন্ধকার যুগের পরিচয় দিয়ে তিনি রচনা আরম্ভ করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যন্ত লেখাটা আমি দেখেছি। শিয়াদের মতো তিনিও এতে দাবী করেছেন যে, হজরত আলীর প্রতি বিবি আয়েশার মনোভাব অপ্রসন্ন ছিল এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হবার কারণ এই মনোভাব থেকেই জন্মায়।

৩৪। "উন্নতির উপায় কি ?", ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩।

৩৫। ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০২।

৩৬। ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর ১৯০৫—ফেব্রুয়ারী ১৯০৬। এরপর 'ইসলাম প্রচারকে'র কোন সংখ্যা আমি দেখিনি। ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়ও 'আল হারুণ' অসমাপ্ত ছিল।

'কোহিনূর' পত্রিকায় বেরিয়েছিল 'উচ্ছ্বাস কাব্য'—'মোসাদ্দাস-ই-হালী'র বঙ্গানুবাদ।[৩৭] অনুবাদক নিবেদন করেছেন :

> মোসাদ্দসে হালী উর্দ্দু ভাষার একখানি সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহাতে আমাদের জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন কাহিনী জলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।... এই অমৃতোপম কাব্যের ফলে যুক্তপ্রদেশে মরা গাঙ্গে জোয়ার ছুটিয়াছে। বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই কষ্টসাধ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি।...
>
> বঙ্গভাষায় "মোসাদ্দস্" ছন্দের অনুকরণ কষ্টকর, তবে করিতে পারিলে কিছু স্থায়ী লাভ হইত। আমি তাহা করিতে না পারিয়াই আপন পথে চলিয়াছি।

মধ্যে মধ্যে অনুবাদ বেশ ভাল হয়েছে। যেমন,

> পশুর সমান হায়! তোমাদের নিদারুণ দশা,
> অপমানে ঘৃণা নাই, সম্মানের নাহি কর আশা।
> সুখের শ্যামল কুঞ্জে প্রেম-মুগ্ধ হয়ে দিবানিশি
> কাটালে অমূল্য কাল, ডুবে গেল সৌভাগ্যের শশী।
> নরকে নাহিক ভয়, স্বর্গসুখ কর না কামনা,
> জ্ঞানধর্ম্ম বিসর্জ্জিলে, বিসর্জ্জিলে মুক্তির সাধনা।
> পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে ঢেলে দিলে পাপের কালিমা,
> তোমাদের সে পাপের কেহ কিরে দিতে পারে সীমা?

৩৭। কোহিনূর, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ১৩১২, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র ১৩১৩। এখানে কাব্য সমাপ্ত হয় নি, অথচ পরবর্তী সংখ্যায় আর প্রকাশিত হয় নি। এরপর 'কোহিনূরে'র প্রথম পর্যায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৮র বৈশাখ থেকে 'কোহিনূর' নবপর্যায় প্রকাশিত হতে থাকে। তাতেও 'উচ্ছ্বাস' বের হয় নি। আবদুল মওদুদ লিখেছেন, '১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ 'জোয়ার ভাটা' নাম দিয়ে 'মুসাদ্দসের' অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন' ("বাংলা সাহিত্যের চর্চায় মুসলমান", সমকাল, শ্রাবণ ১৩৬৬)। এটি কি তাঁর স্বতন্ত্র অনুবাদ?

প্রথম চার চরণের অন্ত্যানুপ্রাস দুষ্ট বিবেচিত হলেও এখানে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও রচনার গতিশীলতা দুইই দেখা যায়।

১৩১১ সালের 'কোহিনূরে' তাঁর রচিত "দৃশ্যকাব্য" 'প্রেমের স্মৃতি' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই নাট্য-রচনার বিষয়বস্তু নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার বিষাদময় জীবনকাহিনী।

১৯০৭ সালের 'সোলতান' পত্রিকায় তাঁর 'শোকগাথা' নামক রচনাটি প্রকাশিত হয়।[৩৮] মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে ২২৮ চরণের এই ছন্দোবদ্ধ শোকোচ্ছ্বাস তিনি রচনা করেন। এর মধ্যে একটু ব্যক্তিগত তথ্য আছে, সেটাই উল্লেখযোগ্য ঃ

হায় আজো মনে পড়ে সেদিনের কথা
যেদিন প্রথম দেখা তোমায়-আমায়,
হৃদয়ের সে প্রগাঢ় প্রীতির প্লাবন
কেমনে করিল পূর্ণ যুগল জীবন!
তোমারি বিপুল স্নেহ—আকুল আহ্বানে
হতভাগ্য এই কবি লভি নববল
অবতীর্ণ হয়েছিল সাহিত্য সংসারে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, শেখ হবিবর রহমান-প্রণীত 'কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা'র প্রারম্ভে ফজলল করিমের লেখা তেরো পৃষ্ঠার 'পূর্ব্বাভাস' সংযোজিত হয়েছে। এখানেও তিনি মেহেরুল্লাহ্‌র প্রতি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

চার

এক অর্থে, শেখ ফজলল করিমের সাহিত্যিক-মানস উনিশ শতকী সাহিত্যচর্চার আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিল। তাঁর রচনার সর্বপ্রধান লক্ষণ হচ্ছে

৩৮। অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী এটি পুনর্মুদ্রিত করেছেন 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৬২)।

আদর্শবাদ। আদর্শ পুরুষ ও রমণীর জীবনচিত্র অঙ্কনই ছিল তাঁর গদ্যরচনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। কবিতায়ও তিনি নানা রকম নীতিবাদ প্রচার করেছেন। রচনার অবলম্বন হিসেবে তিনি কখনো ফারসী কাব্যকাহিনী আশ্রয় করেছিলেন, কখনো বা ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে মালমশলা সংগ্রহ করেছেন। আদর্শ জীবনচরিত রচনার ধারা বিদ্যাসাগরের হাতেই (জীবনচরিত, ১৮৪৯) শুরু হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র এতে যোগ দিয়েছিলেন (শ্রীকৃষ্ণচরিত্র, ১৮৮৬); তারপর একে পরিপুষ্ট করেছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০), যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি এবং শেষ দুই দশকের মুসলমান লেখকেরা। ফারসী কাব্যকাহিনীর গদ্যরূপায়ণও শতাব্দীর প্রথম দিকেই আরম্ভ হয়েছিল—হরিমোহন কর্মকার, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাক প্রভৃতির হাতে। পরে মুসলমান লেখকেরা এই ধারাটিকেও বেগবতী করেছিলেন।

কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ধারার সঙ্গে এই বাহ্যিক ঐক্য বড় কথা নয়। লক্ষ্য করা যাবে যে, উনিশ শতকের humanismএর ছোঁয়া তাঁর রচনায় লাগে নি। তাই তিনি যে দেশের ও যে কালের মানুষ, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর রচনায় মেলা দুষ্কর। হয় সেটা এসেছে নিতান্ত আকস্মিক ভাবে, কথাপ্রসঙ্গে, কিংবা যেখানে তিনি সচেতনভাবে দেশকালের কথা বলেছেন, সেখানে। তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলীর তুলনায় এই অনুভূতির অভিজ্ঞান খুবই সামান্য। বরঞ্চ তাঁর লেখা থেকে এ ধারণাই জন্মায় যে, প্রাকৃত জীবনের প্রতি লেখকের ততটা আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা ছিল না। আদর্শ জীবন বলতে তিনি ধর্মসাধনায় নিয়োজিত জীবনকেই বুঝেছেন; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য— সবকিছু ত্যাগ করে যে জীবন তার স্রষ্টার ধ্যানে সমাহিত হয়েছে— এবং শুধু তাই নয়— যে জীবন অলৌকিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেই জীবনকেই তিনি প্রণতি জানিয়েছেন। আধুনিক পাঠকের কাছে তাঁর এই জীবনবোধের আবেদন গভীর হতে পারে না।

এর ফলে, তিনি রূপকথাকে উপন্যাসের ছাঁচে ঢালার চেষ্টা করে গেলেন, অলৌকিকতাকে বাস্তবের মর্যাদা দিতে চাইলেন— কিন্তু বাস্তব মানুষের জীবন-কাহিনীর কথক হতে পারলেন না। আদর্শবাদিতার আতিশয্যে তাঁর লেখাকে

অনেক সময়েই 'বচন' বলে মনে হয়—'রচনা' বলে মনে হয় না। সংস্কৃত আলংকারিকদের একটি মূল্যবান সিদ্ধান্তের কথা মনে পড়ে। এক শ্রেণীর রচনাকে তাঁরা চিত্রকাব্য নাম দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, চিত্র যেমন বস্তু নয়, বস্তুর অনুকরণ, তেমনি কাব্যের অনুকরণ হচ্ছে চিত্রকাব্য: চিত্রকাব্য রচনার হেতু লেখকের অশক্তিও হতে পারে, আবার উপদেশদান ও প্রচারপ্রবৃত্তি থেকেও এর সৃষ্টি হতে পারে। ফজলল করিমের শক্তি ছিল, কিন্তু নীতিগ্রন্থ-রচনার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়ে সেই শক্তিকে তিনি প্রধানতঃ উপদেশদানেই ব্যবহার করেছিলেন।

এসব কারণেই, তাঁর সৃষ্টিকে আমরা মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা দিতে পারি নে।

আমি অবশ্য ভুলি নি যে, যেকালে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন, সেযুগে তাঁর রচনাবলী বাঙালী মুসলমান সমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। তার প্রধান কারণ, তখন পর্যন্ত সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের রুচিবোধ পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। ঈশপের গল্পের নীতিবাক্যের মতো একটি moral সাবালকসেব্য সাহিত্যেও আমরা আশা করেছি। ফজলল করিম সেই প্রত্যাশা মিটিয়েছিলেন।

কিন্তু সেকাল থেকে কিছুটা দূরে বসে আজ আমাদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, তাঁর প্রচারিত আদর্শবাদের আত্যন্তিক মূল্য কি ছিল? তাঁর জীবনবোধ কিছুটা পলায়নমুখী, লৌকিক জীবনবিরোধী। এমন কি, শরিয়তপন্থী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলেও এই সুফী ভাবধারাপুষ্ট আদর্শবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

উনিশ শতকে ধর্মসাধক ও তাপসদের অলৌকিক জীবনকাহিনী-রচনার ধারাটি ফজলল করিমে এসে পরিণতি লাভ করেছে। ফারসী কাব্যকাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থরচনার কালও এখানে এসে সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপর লেখকেরা নিজেদের কাল নিয়েই সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। বাঙালী মুসলমান লেখকদের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে নজরুল ইসলামের দান অসামান্য। মোজাম্মেল হক-সম্পাদিত যে 'মোসলেম ভারতে' ফজলল করিমের 'রাজর্ষি এবরাহীম' প্রকাশিত হয়েছিল, সেই পত্রিকায়, সেই সময়েই, নজরুল তাঁর প্রথম জীবনের রচনা প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু নজরুলের রচনার প্রাণশক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে নতুন ধারায় সাহিত্যসৃষ্টি করা তখন আর একজন প্রবীণ লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর পালা তাই তখনই সাঙ্গ হল।

পরিশিষ্ট

শেখ ফজলল করিমের গ্রন্থাবলী

১. তৃষ্ণা। করিমন লাইব্রেরী, কাকিনা, রংপুর, পৌষ, ১৩০৭। পৃ ৫+১৯।

২. মানসিংহ। কাকিনা, রংপুর, ১৯০৩। পৃ ১৪+২।

৩. আসবাতে উস ছামা বা ছামাতত্ত্ব। শেখ ওয়াহিদ হোসেন, রংপুর, কার্তিক, ১৩০৭। পৃ ২৭।

৪. পরিত্রাণ। মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, যশোহর, ফাল্গুন, ১৩১০। পৃ ১৪৩+৯।

৫. লায়লী মজনু। ১৯০৩; দ্বি-স ১৯১৪, পৃ ১৫৭+১০; পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ষষ্ঠ-স নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৩৩, পৃ ১৫৭+১৫। অষ্টম-স কলিকাতা, ১৯৩১।

৬. মহর্ষি হজরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতি (রহঃ)। জীবন চরিত। ১৯০৪; পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বি-স, নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯১৪। পৃ ১২৪+৮।

৭. মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফসানী (কদঃ)। জীবনচরিত। [কলিকাতা, ১৯০৪]

৮. আফগানিস্থানের ইতিহাস। ১৯০৯; দ্বি-স মজিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯২৭। পৃ ৯৬+৬।

৯. পথ ও পাথেয়। ১৯১৩; দ্বি-স ১৯১৮; তৃ-স নবযুগ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৫৪। পৃ ১৬২+৮।

১০. চিন্তার চাষ। কলিকাতা, ১৯১৬।

১১. গাথা।

১২. বিবি রহিমা। কলিকাতা, ১৯১৮; দ্বি-স ১৯২৫; তৃ-স ১৯৩৯; চ-স নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৫২। পৃ ১৯১+৪।

১৩. হারুণ অল রশীদের গল্প।

১৪. সোনার বাতী।

১৫. বিবি ফাতেমা। কলিকাতা, ১৯২১; দ্বি-স মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৪০। পৃ ১৫০।

১৬. রাজর্ষি এবরাহীম। কলিকাতা, ১৯২৪; দ্বি-স মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৪০; তৃ-স ১৯৫৫, পৃ ১৬৮।

১৭. বিবি খাদিজা। মজিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯২৭। পৃ ১২০+৮।

১৮. হাতেম তাই।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' তাঁর আরো কয়েকটি প্রকাশিত বইয়ের নাম করা হয়েছে ঃ

১. সরল পদ্য বিকাশ।

২. ওমর খৈয়ামের অনুবাদ (কাব্য)।

৩. বেহেশতের ফুল (গদ্য)।

৪. বাগ ও বাহার (উপন্যাস)।

৫. ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি (কাব্য)।

৬. রাজা মহিমারঞ্জন (কাব্য ও গদ্য মিশ্রিত)।

গ্রন্থপঞ্জী

ক. শেখ ফজলল করিম-রচিত গ্রন্থাবলী

খ. অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থতালিকা

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শকুন্তলা। দ্বিতীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ; কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৯।

২। এম. সিরাজুল হক : সিরাজী-চরিত। কলিকাতা : সিরাজী লাইব্রেরী, ১৯৩৫।

৩। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)। ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬।

৪। (ডক্টর) মুহম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সুফী প্রভাব। কলিকাতা : মোহসীন এণ্ড কোং, ১৯৩৫।

৫। মোজাম্মেল হক : খাজা ময়ীনউদ্দীন চিশ্‌তী। ঢাকা : মজিদীয়া : লাইব্রেরী, ১৩২৫।

৬। ———তাপস-কাহিনী। কলিকাতা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস,।

৭। ———তাপস-জীবনী। কলিকাতা : লতিফ প্রেস, ১৩০৭।

৮। ———হজরত মোহাম্মদ। পঞ্চম সংস্করণ ; কলিকাতা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৩৪২।

৯। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় : সাহিত্যপঞ্জিকা। কলিকাতা, ১৩২২।

১০। শেখ হবিবর রহমান (সাহিত্যরত্ন) : কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা। কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯৩৫।

১১। Blumhardt, J. F.: Catalogue of the Library of the India Office, Vol. II, pt. IV: "Bengali, Oriya and Assamese Books." London, 1905.

১২। ———A Supplementary Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum. London, 1910.

১৩। ———& Wilkinson, J. V. S: Second Supplementary Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum. London, 1939.

১৪। Browne, E. G.: A Literary History of Persia, Vol I. 5th edn.; Cambridge: University Press, 1951.

১৫। Gibb, H. A. R.: Mohammedanisn. 2nd edn.; "The Home University Library"; London: Oxford University Press, 1950.

১৬। Imperial Library: Author Catalogue of Printed Books in the Bengali Language, 2 Vols. Calcutta, 1941-43.

১৭। The Koran. translaled by Rodwell, J. M. "Everyman's Library"; London: J. M. Dent & Sons Ltd. Repinted 1953.

১৮। Tarachand: Influence of Islam on Indian Culture. Allahabad: The Indian Press Ltd., 1946.

গ. সাময়িকপত্র

১৯। ইসলাম প্রচারক। কলিকাতা, ১৯০০-১৯০৬।

২০। কোহিনূর। কলিকাতা, ১৩১২-১৩১৩। ২১। নবনূর। কলিকাতা, ১৩১০-১৩১১।

২২। মোহাম্মদী। ঢাকা, ১৩৬২। ২৩। সমকাল। ঢাকা, ১৩৬৬।